দ্বিতীয় অধ্যায়

রমাপদ চৌধুরী ও সমকালীন কথাকারেরা

বাংলা কথাসাহিত্য, বিশেষ করে উপন্যাসের আবির্ভাব আধুনিক কালে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এর সূচনা ও সমৃদ্ধি। সূচনালগ্নের কাহিনিমূলক জীবনবৃত্তান্তের বাইরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলমে উপন্যাস এল নতুন বিভঙ্গে। ছোটগল্প এল আরও পরে অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ পর্বে। রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়েই যথার্থ ছোটগল্পেরও সূচনা। উপন্যাসের ব্যাপক আয়তন না থাকলেও ছোটগল্পের সীমিত পরিসরে সমকালীন জগৎ ও জীবনের বহুমুখী জটিল বিন্যাসের সার্থকপ্রতিফলন ঘটল ছোটগল্পে। খণ্ড খণ্ড মুহূর্তের জীবন ভাষ্য হয়ে উঠল ছোটগল্প। আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় বলি,

> ‘‘একটি ক্ষুদ্র আখ্যান-খণ্ডে সমগ্র জীবন তাৎপর্য প্রতিবিম্বিত করাই ছোটগল্পের উদ্দেশ্য ও শিল্পরূপের প্রেরণা। এ যেন কথাশিল্পের কারুকার্য খচিত একটি ছোট পাত্রে সমগ্র জীবনপ্রবাহের গতিবেগ ও সমুদ্রাভিসারের ইঙ্গিতটুকু ধরিয়া রাখা; বৃহদাকার ঘটনা-ইক্ষুদণ্ডের অন্তর্নিহিত সুমিষ্ট রসসারটুকুকে নিষ্কাশন করিয়া বস্তুভার-অসহিষ্ণু অথচ রসপিপাসু ওষ্ঠের নিকট তুলিয়া ধরা। ছোটর মধ্যে যে বড়র বীজ প্রচ্ছন্ন, সমগ্র জীবনের অভিপ্রায় যে দুই একটি ঘটনার রেখাবেষ্টনীর মধ্যে সংহত থাকে, অনেক জল জমিয়া যে এক টুকরা স্ফটিক স্বচ্ছ বরফ আমাদের পিপাসা-তৃপ্তি ঘটায় — এই নিগূঢ় জীবন-সত্যটি ছোটগল্পে বিধৃত।’’[১]

ছোটগল্পের তুলনায় অনেক বিস্তৃত পরিসরে আধুনিক জটিল জীবনের ভণ্ডামী, নীচতা, নিষ্ঠুরতা, চরিত্রহীনতা, স্বার্থপরতা, আদর্শহীনতার কঠিন অথচ বাস্তব সত্য উঠে এল উপন্যাসে। তবে এক্ষেত্রে একটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হয় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলার

সমাজ জীবনে একরকম সুখ স্বাচ্ছন্দ ও শান্তির বাতাবরণ ছিল। যদিও এরই মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের স্বপক্ষে একটা কথা বলা যেতে পারে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আমাদের ঘরের মধ্যে এসে পড়েনি। ফলে আমাদের সমাজ জীবনকে ততটা নাড়া দেয়নি, ভেঙে দেয়নি।

> ''দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদের ঘরের আঙিনায় এসে পৌঁছল। তাকে আর অস্বীকার করা গেল না। মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, বন্যার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ংকর যুদ্ধ ভারতে — বিশেষ করে আসামে ও বঙ্গদেশের ঘাড়ে এসে পড়ল। আমাদের সুখী স্বচ্ছল শান্ত জীবনযাত্রার উপর কালো ছায়া ফেলে বিশ্বযুদ্ধ দুয়ারে এসে দাঁড়াল। সেদিন তাকে ফিরিয়ে দেবার সাধ্য আমাদের ছিল না। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে যুদ্ধের অংশীদার হতে হয়েছিল। জাপানি বোমার অভিজ্ঞতা যেদিন বঙ্গদেশ প্রথম পেল, সেদিনটি বাঙালির জীবনে অবিস্মরণীয় ছিল। এতদিন যাকে দূর থেকে দেখেছি, কানে শুনেছি মৃত্যুনাদ, পড়েছি রণজয়গাথা, আজ সে আমাদেরই ঘরে এসে পড়েছে। . . . দুর্ভিক্ষ, নিষ্প্রদীপের মহড়া, বিমান আক্রমণ-প্রতিরোধ, বিফল প্রাচীর, ট্রেঞ্চ, সাইরেন, কন্ট্রোল, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, জনযুদ্ধের বুলি, ইংরেজের মিথ্যা প্রচার, জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান সংকট ঃ এ সবই সেদিনের বাঙালিকে ঘিরে ধরেছিল। বঙ্গদেশের বুকে মিত্রপক্ষীয় সৈন্য সমাবেশ এবং তারই আনুষঙ্গিক ফল — সমাজজীবনে শৈথিল্য, অনাচার, পতিতাবৃত্তির প্রসার, কালোবাজারির গোপন সুরঙ্গপথে বাণিজ্য, ঘুষ, চোরাকারবার, ও ভারতরক্ষা আইনের দাপটে সেদিনের বাঙালি অভ্যস্ত হয়েছিল।''[২]

সেদিনের যুদ্ধ আমাদের সীমান্তে, তাণ্ডব আমাদের আঙিনায়। যুদ্ধের এই পরোক্ষ রূপটি সেদিনের বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে কথাসাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। এই দ্রুত বদলে যাওয়া সমাজ পটভূমিতে দাঁড়িয়ে যাঁরা কথাসাহিত্য রচনার প্রবহমানতাকে সচল রেখেছিলেন — সতীনাথ ভাদুড়ী, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নবেন্দু ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সমরেশ বসু, বিমল কর, অমিয়ভূষণ মজুমদার, রমাপদ চৌধুরী, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রমুখ। উল্লিখিত কথাসাহিত্যিকেরা উপন্যাস ও ছোটগল্প দুই-ই রচনা করেছেন। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পব্যক্তিত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা কোনও নির্দিষ্ট শাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করবো না। আবার সম্পূর্ণ কথাসাহিত্য বিষয়েও আলোচনার অবকাশ নেই। কেবল উদ্দীষ্ট কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর লেখনী জগতের ধারাটিকে বোঝার ক্ষেত্রে তাঁর সমসাময়িকদের সঙ্গে প্রতিতুলনায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার প্রয়াস আছে এই অধ্যায়ে। এই পর্বের লেখকদের মধ্যে সতীনাথ ভাদুড়ী ও সুবোধ ঘোষ দুজনেই অন্যান্য লেখকদের তুলনায় অনেক বেশি বয়সে সাহিত্য ক্ষেত্রে এসেছেন। ফলে বয়সের দিক থেকে কয়েক বছর পূর্বের হলেও লেখার জগতে সমসাময়িক হিসেবে আমরা আমাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছি।

।।এক।।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে সাহিত্য জগতে লেখার ক্ষেত্রে কলম ধরেছিলেন সতীনাথ ভাদুড়ী। পূর্ণিয়াবাসী উকিল ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী ও তাঁর পত্নী রাজবালার সন্তান সতীনাথ ভাদুড়ীর জন্ম ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে; মৃত্যু ৩০ মার্চ ১৯৬৫। পূর্ণিয়াতেই তাঁর জন্ম ও মৃত্যু। তাঁর শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্র পূর্ণিয়া জেলা — রাজনীতি ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র বিহার। তেত্রিশ বছর বয়স থেকে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন। এরপর রাজনীতির কারণেই তাঁকে বহুবার জেলে যেতে হয়েছিল। ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকাকালীন তিনি লিখেছেন 'জাগরী' (১৯৪৫) উপন্যাস। কিন্তু কলকাতার অন্যতম প্রকাশক সংস্থাগুলি গ্রন্থটি প্রকাশে রাজি না হওয়ায় প্রাক্তন বিপ্লবীদের সমবায় প্রেস থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় অক্টোবর, ১৯৪৫ সালে। তাঁর প্রথম গল্প গ্রন্থ 'গণনায়ক' (এপ্রিল ১৯৪৮)। দ্বিতীয় উপন্যাস 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' (আগস্ট ১৯৪৯)।

অবশ্য এর চার মাস পূর্বে অর্থাৎ এপ্রিল ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের প্রথম চরণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় চরণ প্রকাশিত হয় এর ঠিক দুবছর পরে, মে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় গল্পগ্রন্থ 'অপরিচিতা' (১৯৫০), উপন্যাস 'অচিন রাগিনী' (১৯৫৪), গল্প গ্রন্থ 'চকাচকী' (১৯৫৬), উপন্যাস 'সংকট' (১৯৫৭), গল্পগ্রন্থ 'পত্রলেখার বাবা' (১৯৫৯), 'জলভ্রমি' (১৯৬২), 'আলোকদৃষ্টি' (১৯৬৩), এবং শেষ উপন্যাস 'দিগভ্রান্ত' (১৯৬৬)। 'দিগভ্রান্ত' লেখকের মৃত্যুর পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্‌মুহূর্তে আধুনিক শিল্পভাবনায় সমৃদ্ধ সতীনাথ ভাদুড়ী বাংলা কথাসাহিত্য জগতে এলেন 'জাগরী' (১৯৪৫) নিয়ে। পাঠক ও সমালোচক মহলের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি তাঁকে এনে দিল 'রবীন্দ্র পুরস্কার' (১৯৫০)। বাংলা কথাসাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত 'জাগরী' উপন্যাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পরবর্তীকালের গণবিক্ষোভের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস 'জাগরী'। তৎকালীন রাজনৈতিক আবহ পারিবারিক ভাবতরঙ্গেও যে প্রবেশ করেছিল এবং এর ফলে হাত গুটিয়ে থাকার কোনো অবকাশও যে নেই। উপন্যাসের শুরু হয়েছে এইভাবে — ''দুই নং ওয়ার্ডের অশ্বত্থ গাছটির উপরের শাখাটিতে গোধূলির ম্লান আলো চিকচিক করিতেছে। অনেকগুলি পাখি একবার এ ডালে একবার ও ডালে যাইতেছে। একদণ্ড বিশ্রাম নাই।''[৩] সময়ের রাজনীতির হাত থেকে মুক্তি নেই মানুষের। রাজনীতির প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় কারোর পক্ষে। রাজনীতি ব্যক্তি-সমাজ জীবনের প্রতিটি আবর্ত সঙ্কুল করে তুলেছে। বিলু, নীলু, বাবা, মা চারটি চরিত্রের আত্মকথনের মধ্য দিয়ে জীবনের অন্তর্বর্তী শাশ্বত সত্তাকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। জীবনে অনেক ঝড় আসে, আবার থেমেও যায়। মধ্যবর্তী অস্থির সময় কেবল উদ্বেগ-উত্তেজনা আর কঠিন লড়াইয়ের। ফলে রাজনৈতিক পটভূমিতে 'জাগরী' লেখা হলেও তা কিন্তু একান্তই রাজনৈতিক উপন্যাস হয়ে থাকে না। তা যেন হয়ে ওঠে জীবনবোধের, আত্ম অনুসন্ধানের পথে শাশ্বত জীবন সত্যের অন্যতম আখ্যান। উপন্যাসের শুরুতে যে অস্থির, অবিশ্রাম পরিবেশের ছবি লক্ষ করি, শেষে সেই চঞ্চল পরিবেশে স্বাভাবিকতার প্রকাশ। সতীনাথ ভাদুড়ী লিখেছেন —

> ‘‘ . . . ধমনীর স্পন্দন আবার আরম্ভ হয়। গাছে গাছে পাখির কাকলি। পাতায় পাতায় প্রভাত সমীরের দোলা। লাস্যময়ী পৃথিবী আবার নানা ছন্দে দোলায়িত হইয়া উঠিয়াছে।”[৪]

মানুষের পরিবর্তন মানুষেরই হাতে। পারিপার্শ্বিকতা তাতে সঙ্গ দেয় মাত্র। কিন্তু তাতেও কথা শেষ হয়ে যায় না। মানুষের পাশাপাশি পরিবেশকেও বদলে দেয় মানুষ। বিহারের অনগ্রসর গ্রামের সমাজ জীবন তার প্রকৃতি ও পরিবর্তনের আবহে রচিত সতীনাথ ভাদুড়ীর তৃতীয় উপন্যাস ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’। গ্রামের অতিসাধারণ দরিদ্র জীবনের মুহূর্তগুলোকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন উপন্যাসের পাতায় পাতায়। বাঙালি, বিহারির মিশ্র সংস্কৃতি বেড়ে ওঠার সুযোগ হাতছাড়া করেননি লেখক। অভিজ্ঞতার জারক রসে স্থানীয় সমাজ, পরিবেশ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষা, সংস্কৃতি সব কিছু দক্ষ শিল্পীর কলমে উঠে এসেছে। পরিবেশ বর্ণনায় বৈচিত্র এসেছে লেখকের কলমে —

> ‘‘অদ্ভুত এই ‘ধানকাটুনী’র রাজ্য। নতুন পোয়াল আর পচা পাঁটের গন্ধে ভরা দহের ধার রোজ রাতে কুয়াশায় ঢেকে যায়। আগুনের ‘ঘুর’-এর ক্ষীণ আলোয়, কারো মুখ চেনার উপায় নেই অথচ কাটা ধানের পাহাড়ের উপর তাদের ছায়া নড়ে। সোনার পাহাড়গুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো হাতির মতো দেখতে লাগে। ধানখেগো হাঁসগুলোর ডাক হঠাৎ ছোট ছেলের কান্না বলে ভুল হয়। খড়ের গাদার মধ্যে সর্বাঙ্গ ঢুকিয়ে রাতে ঘুমুতে হয়। জলের মধ্য দিয়ে ‘পানডুব্বী ভূত’ রাত দুপুরে ছপ্‌ছপ্‌ করে চলে বেড়ায় — সেই শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। দহের উপর ‘রক্‌স’ ভূত আলো জ্বালিয়ে হাতছানি দেয়।”[৫]

ধানকাটার এই সময়েই সমস্ত রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার সমস্ত কিছুই তাৎমাটুলি থেকে আলাদা। সামাজিক বাধা-নিষেধ এখানে অনেকটাই শিথিল। জাত-পাত নিয়েও ততটা কচকচানি নেই।

এখানে শুধুই কাজের কদর। অন্যদিকে বাঁকা নড়বড়ে খড়ের ঘরের বাসিন্দা তাৎমাদের রোজা, রোজগার রামায়ণ নিয়েই তাদের জীবন। লেখাপড়া না জানলেও রামায়ণের নজির এদের মোড়লদের কথায় কথায়। কেবল নিজেদের ধর্মের বিশেষত্বটাকে অন্যের সামনে তুলে ধরার প্রবল চেষ্টা। তাৎমাটুলির এই তাৎমারা জাতিতে তাঁতি। কুয়োর বালি ছেঁকে, ঘরামির কাজ করে তারা অর্থ উপার্জন করে। কার্তিক-অঘ্রাণ এলেই পুরুষদের রোজগার অনেকটা কমে আসে। এই কারণে এই সময়ে তাৎমা মেয়েরা ধানকাটনীর রাজ্যে যাত্রা করে। তাৎমাদের পাশাপাশি উপন্যাসে ধাঙরদের জীবনকথা উঠে এসেছে। ধাঙরদের পূর্বপুরুষেরা নাকি ওঁরাও সম্প্রদায়ের। সাঁওতাল পরগণা থেকে তারা ধাঙরটুলিতে এসে আস্তানা গেড়েছিল। এই ধাঙর এবং তাৎমাদের মধ্যে ধর্ম, আচার-সংস্কার নিয়ে রেষারেষি, বিবাদ চলতেই থাকে। দরিদ্র, বঞ্চিত এবং প্রথাগত শিক্ষার অভাবে সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলোর জীবন এমন পাকে পড়ে আছে। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র চেতন অবচেতনে দেশ-কাল-সমাজের অধীনস্থ নীচুতলার পদদলিত মানুষ। ফলে এই নিম্নশ্রেণির বিস্তীর্ণ সমাজবাস্তবতার উপন্যাস হয়ে ওঠে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'।

।।দুই।।

বাংলা কথাসাহিত্যে সুবোধ ঘোষের আবির্ভাব আকস্মিক ও চমকপ্রদ। জন্ম ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে হাজারিবাগে। পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুরের বহর গ্রাম। বেশ পরিণত বয়সে তিনি সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন। লেখালেখির ক্ষেত্রে তাঁর আত্মপ্রকাশ 'অযান্ত্রিক' (১৯৪০) ও 'ফসিল' গল্পের মধ্য দিয়ে। উপন্যাস লিখেছেন আরও চার বছর পরে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪)। সুবোধ ঘোষ রচিত ছোটগল্প গ্রন্থ 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার', 'শুক্লাভিসার', 'গ্রামযমুনা', ও 'মণিকর্ণিকা'। উপন্যাস — 'তিলাঞ্জলি', 'একটি নমস্কারে', 'গঙ্গোত্রী' ও 'শতভিষা'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে লেখা 'অযান্ত্রিক' (১৯৪০) যন্ত্রসভ্যতা ও মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের দলিল। গল্পের প্রধান চরিত্র ট্যাক্সিচালক বিমল। পুরোনো আমলের একটা জীর্ণ ফোর্ড গাড়ির প্রতি তার মায়া। গাড়িটি দেখতে ''বাস্তবিক বড় দৃষ্টিকটু। তালিমারা হুড, সামনের আর্শিটা ভাঙা,

তোবড়ানো বনেট, কালিঝুলি মাখা পরদা আর চারটে চাকার টায়ার পটি লাগানো; সে এক অপূর্ব্বশ্রী। পাদানীতে পা দিলে মাড়ানো কুকুরের মত ক্যাঁচ করে আর্তনাদ করে ওঠে। মোটা তেলের ছাপ লেগে সীটগুলি এত কলঙ্কিত যে, সুবেশ কোন ভদ্রলোককে পায়ে ধরে সাধলেও তাতে বসতে রাজী হবে না। দরজাগুলো বন্ধ করতে বেশ বেগ পেতে হয়, আর যদিও বন্ধ হল তো তাকে খোলা হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য। সীটের ওপর বসলেই উপবেশকের মাথায় আর মুখে এসে লাগবে ওপরের দড়িতে ঝোলানো বিমলের গামছা, নোংরা গোটা দুই গেঞ্জী আর তেলচিটে আলোয়ান।"[৬]

ফলে নিতান্তই দায়ে পড়ে লোকে বিমলের ট্যাক্সিটায় ওঠে। দেখতে অদ্ভুতরকমের হলেও কাজের বেলায় অনেক অসাধ্য সাধন করে। বড়ো বড়ো চাঁইগাড়ীর পক্ষে যা অসাধ্য তা বিমলের ট্যাক্সি অবলীলায় করে যায়। দুর্গম কয়লাখনি অঞ্চলের ভাঙাচোরা ভয়াবহ জংলী পথে ঘোর বর্ষার রাতেও অকুতোভয়ে এগিয়ে চলে বিমলের অক্ষয় ট্যাক্সি। পুরোনো ট্যাক্সির প্রতি বিমলের মায়া-মমতা, রাগ-অনুরাগ, মান-অভিমান, আসক্তি সবই যেন যন্ত্রকেও জীবন বানিয়ে দিয়েছে। যন্ত্রসভ্যতার অভিঘাত এবং তার অনিবার্যতা ও আবশ্যকতায় যন্ত্র আর মানুষের জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত, এই সত্যই মনে করিয়ে দেয় সুবোধ ঘোষের অযান্ত্রিক গল্প। শ্রমজীবী মানুষের কর্মযজ্ঞে মানুষও একরকম যন্ত্র হয়ে উঠছে। তাই গল্পের শেষে আমরা দেখি — ''শোক আর নেশা। জগদ্দলের পাঁজর খুলে পড়ছে একে একে। বিমলের চৈতন্যও থেকে থেকে কোন অন্তহীন নৈঃশব্দের আবর্তে যেন পাক দিয়ে নেমে যাচ্ছে অতলে। তার পরেই লঘু ভার হয়ে ভেসে উঠছে ওপরে। এরই মাঝে শুনতে পাচ্ছে — ঠং ঠং ঠকাং ঠকাং — জগদ্দলের সমাধি খনন চলছে। যেন কোদাল আর শাবলের শব্দ।"[৭] সার্বিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে যন্ত্রমানবের যাত্রাপথে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর অবস্থান ও মতাদর্শ বিচিত্রগামী হয়ে উঠেছে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের সহযোগিতা করেছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের মুক্তির সংগ্রামকে শ্রদ্ধা করেও তিনি গান্ধীবাদী নন। আবার তিনি মার্কসবাদীও নন। তাঁর ভাবনায় গোটা ইউরোপ এমনকি সেখানকার সর্বহারা দলও আমাদের শোষক। এই চেতনাতেই 'তিলাঞ্জলি' লিখেছিলেন সুবোধ ঘোষ। শুধু তাই নয়, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির অবসান হলে খাদ্য সংকট ও চোরাকারবারিদের দৌলতে যে মন্বন্তর বিশেষভাবে শ্রমজীবী মানুষের, দরিদ্র

মানুষের যে হাহাকার এর থেকে দূরে থাকা মানুষ — ''বালিগঞ্জ প্লেসের ঐ একতলা বাড়ির দক্ষিণ কোণের ঘরটা সত্যিকারের আর্টিস্ট ও ভাবুক মানুষের পক্ষে আদর্শ আশ্রয়। পীচ ঢালা রাস্তার চারটে কালো ফ্রেম, কাঁঠাল ও শিউলির সবুজের উচ্ছলতা, কাঠবেড়ালির হুটোপুটি, বাসিফুলের থমকানো গন্ধ, গম্ভীর নিসর্গের গলিত জটার মতো মেঘ — এর মধ্যে ঐ আশ্রয়ে শিশির থাকে। গান-বাজনা নিয়ে গবেষণা করে সুরের জগতে সে ভাসে কত সুর ধরে রেখেছে সে তার নানা কণ্ঠে।''[৮] লেখক নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি নিয়ে সমাজের উচ্চবর্গের এই অবস্থানকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। 'তিলাঞ্জলি' তাই এক অর্থে দুর্ভিক্ষের এবং উচ্চবিত্তের শ্রেণি বৈষম্যের উপন্যাসও বটে।

।। তিন।।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমসাময়িক কালের অন্যতম কথাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার বালিয়া ডিঙি গ্রামে। পিতৃদত্ত নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্য রচনার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরেই লেখাপত্রে তিনি 'নারায়ণ' নামটি ব্যবহার করতে থাকেন। পরবর্তীকালে এই নামেই পাঠকের কাছে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'উপনিবেশ' ১ম পর্ব (১৯৪৩)। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে লেখেন আরও দুটি পর্ব। এই উপন্যাস পাঠকের কাছে তাঁকে জনপ্রিয়তা এনে দেয়। বঙ্গোপসাগর উপকূলে চরইসমাইলে ছিল পর্তুগীজদের শেষ উপনিবেশ। তাদেরই বংশধর গঞ্জালেস-লিসি-সিবাস্থিয়া। ভিষগরত্ন, মণিমোহন, মুক্তোর দল হাত মেলায় পর্তুগীজদের সঙ্গে। নদীর মতো মানুষের স্রোতধারায় জীবনের একূল ভাঙে ওকূল গড়ে। বিষয়ের উপস্থাপনা এবং ইতিহাস চেতনায় 'উপনিবেশ' অনন্য সৃষ্টি। উত্তরবঙ্গের জেলা শহর জলপাইগুড়ি থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কর্মজীবন শুরু হয়। ফলে উত্তরবঙ্গের মফস্বল শহর, চাবাগান, প্রকৃতি, ইতিহাস বারবার তাঁর লেখার বিষয় হয়ে উঠেছে। 'মন্দ্রমুখর' (১৯৪৫), 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' (১৯৪৯), 'শিলালিপি' (১৯৪৯), 'মহানন্দা' (১৯৫১), 'লালমাটি' (১৯৫২) উত্তরবঙ্গের পটভূমিতে লেখা উপন্যাস। এছাড়াও কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবন, তার জটিলতা বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোটগল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। দেশভাগ ও ছিন্নমূল মানুষ নিয়ে লিখেছেন বহু গল্প এবং উপন্যাস 'বিদিশা'।

যন্ত্রসভ্যতার যুগে মূল্যবোধের পরিবর্তনে সার্বিক অবক্ষয় নেমে এসেছে মানব জীবনে। জীবন ও মূল্যবোধের এই অবক্ষয়িত রূপ তুলে ধরেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'মহানন্দা' (১৯৫১) উপন্যাসে। 'মহানন্দা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫১ খিস্টাব্দে। উপন্যাসটি দুটি অধ্যায়ে বিভাজিত। প্রথম অধ্যায়ের পনেরোটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ উত্তরবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের জীবন বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশটি পরিচ্ছেদে উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র নীতিশ ও অলকার কলকাতা জীবন। ঔপন্যাসিক নদী ও জীবনের সমার্থক ভাবনাকে যেন ভাষা দিয়েছেন 'মহানন্দা' উপন্যাসে। মহানন্দার যৌবনভরা অতীত, অবক্ষয়ী বর্তমান এবং এগিয়ে চলার ভবিষ্যতকে যেন মানব জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। চরিত্রের ভাবনাগুলো যেন নদীর অবস্থানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সেই সঙ্গে নদী মহানন্দাও যেন একটি চরিত্র রূপে উপন্যাসে জায়গা করে নিয়েছে। অতীতের গৌরব বরেন্দ্রভূমিতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে মানুষের ঢল নেমেছিল পথে। উপন্যাসে আছে "সেই পাগল আসছে গৌড়ে। মহানন্দা, ভাগীরথী, কালিন্দী, ফুল্লরা আর টাঙনের জল তার প্রতীক্ষায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। হোসেন শাহ প্রমাদ গুনলেন . . . মহাপ্রভুর পদপাতে গৌড় ধন্য হল, চরিতার্থ হল রামকেলি, নগরের পথে পথে উঠল নামকীর্তনের কলরোল। . . . সাকরমল্লিক সন্তোষ শ্রীরূপ গোস্বামী হয়ে সর্বত্যাগী বৈরাগী বেশে নেমে পড়লেন।"[৯] রাজা হোসেন শাহের অপশাসন এবং সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে বরেন্দ্রভূমির মানুষ চৈতন্যের প্রেরণায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে দিনাজপুরের সেদিনের জনজোয়ার অতীতের ঐতিহ্যপূর্ণ গৌরবকেই স্মরণ করায়। কিন্তু সেই ধর্মীয় বিপ্লবের জোয়ারে উজ্জীবিত সমাজবিপ্লব এবং বর্ষামাতাল মহানন্দার উদ্দীপনা এখন স্মৃতি মাত্র। অতীতের প্রবাহ আর নেই। প্রবল হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাসস্থানের কারণে পাহাড়, জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন, ভূমি ক্ষয়, নোংরা আবর্জনা নদীতে ক্ষেপন, সংস্কারের অভাবে মহানন্দা হারিয়ে ফেলছে তার পুরোনো ঐতিহ্য। একসময়ের উত্তাল মহানন্দা যন্ত্রসভ্যতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ঔপন্যাসিকের ভাষায় —

> "অজগর সাপের মতো দু'দুটো ফাঁসের মতো দুটো রেল কোম্পানির ব্রীজ পড়েছে। হিমালয়ের গা থেকে কেটে কেটে

ওয়াগনের পর ওয়াগন ভর্তি করেছে পাথরে, তারপর সেই পাথর এনে ঢেলেছে মহানন্দার জলে। পাহাড়ী নদীর উদ্দাম প্রাণশক্তি বহুদিন ধরে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে সেই জগদ্দল, ফেনিল গর্জন করে উঠেছে ক্ষুদ্র আক্রোশে, ভয়াল শব্দে জলচক্রে ঘুরিয়েছে নিজের অর্থহীন উন্মত্ততার মতো, তারপর 'খেদায়' আটকে পড়া বুনো হাতী যেমন করে পোষ মানে, তেমনি করে আত্মসমর্পণ করেছে দুর্বিনীত মানুষের যন্ত্রবিদ্যার কাছে।"[১০]

যন্ত্রসভ্যতার কাছে মহানন্দার এই আত্মসমর্পণ মানবজীবন ও মূল্যবোধের অবক্ষয়িত রূপকেই আভাসিত করে। মহানন্দার ক্রমাগত শীর্ণ হয়ে যাওয়ার অর্থ সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক সংকট। কিন্তু হাজার সংকটেও নদী যেমন তার গতি পরিবর্তন করে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। হয়তো সেক্ষেত্রে আর পূর্বের মতো স্রোতের বেগ থাকে না। প্রাণের স্পন্দন থাকে না। তবু শীর্ণকায়া নিয়ে গতি অব্যাহত রাখতে চায়। তেমনি যুদ্ধকালীন সময়ে ও তার পরবর্তীকালে মানব জীবনে বিশেষত অতিসাধারণ মানুষদের যে আর্থিক অনটন, মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত শ্রেণি নির্বিশেষে প্রত্যেকের উপর আধিপত্যের খবরদারি এবং এরফলে ব্যক্তি স্বার্থের লড়াই, বিচ্ছিন্নতা, বিষাদ, নিঃসঙ্গতা এসবই শীর্ণকায়া নদীরূপ মানব জীবনেরই প্রক্রিয়া মাত্র। ফলে এসবের মধ্যেও লড়াই করে বেঁচে থাকে মানুষ। সেই অর্থে সংগ্রামী জীবন মানসের প্রবাহের উপন্যাস নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মহানন্দা'। উপস্থাপন রীতি, অতীত ও সমকালীন বাস্তবের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি অনবদ্য ও অবিস্মরণীয়।

।।চার।।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের অন্যতম ব্যতিক্রমী লেখক অমিয়ভূষণ মজুমদার। জন্ম ২২ মার্চ, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান কোচবিহার জেলায়, মাতুলালয়ে। পিতৃনিবাস তৎকালীন উত্তরবঙ্গের পাবনা জেলার পদ্মাপারের পাকুড়িয়া গ্রামে, হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে; বর্তমান বাংলাদেশে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সপরিবারে কোচবিহারে আগমন। অমিয়ভূষণ মজুমদার কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ

থেকে ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করার এক বছরের জন্য ডাকঘরে কেরানির চাকরিতে যোগ দেন। চাকরি জীবনে প্রবেশ করার পর নিজের মধ্যে নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন। ফলে নিজেকে একরকম বাঁচানোর তাগিদে কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসার অভ্যাস তৈরি করলেন। তাঁর প্রথম গল্প 'প্রমীলার বিয়ে' 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর নিত্যনতুন বিষয়-বিন্যাসে নিজেকে প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন গল্প উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। সম্পূর্ণপ্রচারবিমুখ কথাকার অমিয়ভূষণ মজুমদার পরিচিত ভূগোলের মধ্যেই জীবনের সন্ধান করেছেন। ফলে উপন্যাসের পটভূমিতে পারিপার্শ্বিক স্থান উঠে এলেও মানুষই তাঁর লেখার মূল উপজীব্য। আত্মকথায় প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি ব্যক্ত করেছেন—

> ''আমি লোকের কথা বলতে চেয়েছি, অঞ্চলের কথা নয়। মানুষের কথা বলতে গেলে তাকে মাটিতে দাঁড় করাতে হয়, মাথার উপরে আকাশ দিতে হয়, আবহাওয়া, গাছ-গাছড়া দিতে হয়। এসব করতে নিজের চোখে দেখা মাটি, আকাশ, জল, গাছ আঁকা যত সহজ, অন্যের মুখে অপরিচিত সেসবের কথা শুনে সে আঁকা ততটা ভালো হয় না। সেজন্য হয়তো পদ্মা থেকে শুরু করে কাঞ্চনজঙ্ঘা এই ভূ-ভাগ আমি বেশি এঁকেছি।''[১১]

জীবনের উপস্থাপনায় নিছক বর্ণনাকে তিনি মুখ্য করে তোলেননি। তাঁর লেখার তাৎপর্য গড়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক রাজনীতি ও সমাজতাত্ত্বিক অন্তর্বয়নের মধ্য দিয়ে। 'নয়নতারা', 'রাজনগর', 'গড়শ্রী খণ্ড', 'দুখিয়ার কুঠি', 'মহিষকুড়ার উপকথা', 'বিনদনি', 'মাকচক হরিণ' উপন্যাসগুলি তারই উজ্জ্বল সাক্ষর বহন করে।

উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলে বসবাসকারী রাভা জনগোষ্ঠীর ক্রমশ অবলুপ্তির জীবন নিয়ে অমিয়ভূষণ মজুমদার লিখেছেন 'মাকচক হরিণ' উপন্যাস। 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় ১৯৯১ খিস্টাব্দে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। বিশ্বায়নের জোয়ার এবং সাংস্কৃতিক রাজনীতির কবলে আক্রান্ত ডুয়ার্সের রাভা জনগোষ্ঠী। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই করে চলেছে

আজও। নিশ্চিত বিলুপ্তি ছাড়া যেন তাদের আর পথ খোলা নেই। রাভা জনগোষ্ঠীর মানুষের এই যন্ত্রণার ঐতিহাসিক দলিল 'মাকচক হরিণ'। রাভা জনগোষ্ঠীর অনেক মানুষেরা বাঁচার তাগিদে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। কেউ হিন্দু, মুসলমান কিংবা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে জীবন অতিবাহিত করেছেন। উপন্যাসে আছে — ''প্রথম জমিয়ালা কয়েক রাভা হিন্দু হইল। স্বামী হিন্দু হইলে রাভার বেটিছাওয়া বা কী করে? তার দেখাদেখি যার জমি কম, তেমন রাভাও কৃষ্ণভকত। তো সেই তো ঠাকুরমা আর আমি একইসঙ্গে শর্মার কাছে দীক্ষা নিয়ন্ত হিন্দু হই। . . . তো আমাক কৃষ্ণপূজার মন্ত্র দিয়া রাভা-মানুষকে হিন্দু করার অধিকার দিয়া, অধিকারী করি গেইল।"[১২] কিন্তু পোশাকের মতো যে-ধর্মই তারা গ্রহণ করুক না কেন অন্তরে সেই রাভা অতীতের নিজস্ব ধর্মেই স্থির থেকে যান। কেবল নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার কঠিন সংগ্রামে এই পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে রাভা জনগোষ্ঠীর মানুষেরা। 'মাকচক হরিণ' উপন্যাসে মানব জীবনের যে-সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে তার প্রাসঙ্গিকতা আজও আমাদের তাড়িত করে, ভাবতে বাধ্য করে। বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির জালে গোষ্ঠীচেতনা যেমন প্রবল হচ্ছে তেমনি তাকে টিকিয়ে রাখাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। যে-কারণে রাভা জনগোষ্ঠীর মতো অনেক জনগোষ্ঠী ও তার সমাজ সংস্কৃতি বিলুপ্তির পথে। ফলে পরিবর্তিত সমাজ কাঠামোয় মানব জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম উপন্যাস হয়ে ওঠে 'মাকচক হরিণ'।

।।পাঁচ।।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বাংলার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যাঁরা জীবনকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করেছিলেন তাঁদের একজন বিমল কর। জন্ম ১৯২১ খিস্টাব্দে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার শঙ্খচূড় গ্রামে। শৈশব কাটিয়েছেন উত্তরপ্রদেশ, বিহার, বাংলায়। কলকাতায় প্রথম আসেন ১৯৩৯ খিস্টাব্দে। বিদ্যাসাগর কলেজে কলেজ জীবন কাটানোর পর পাকাপাকিভাবে কলকাতায় বসতি ১৯৪৬ খিস্টাব্দে থেকে। বিমল কর শহর জীবন নিয়েই উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর প্রথম বড় উপন্যাস 'দেওয়াল'। উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ খিস্টাব্দের কলকাতা শহর ও তার জীবন। তাঁর লেখা অন্যান্য উপন্যাস 'কেরানীপাড়ার কাব্য',

'অপরাহ্ন', 'পূর্ণ-অপূর্ণ', 'ভুবনেশ্বরী', 'জীবিত ও মৃত', 'পরিচয়', 'খড়কুটো', 'গ্রহণ', 'বালিকা বধূ', 'অন্তরাল', 'দংশ', 'এই যুবকেরা', 'মোহ', 'দ্বীপ', 'প্রচ্ছন্ন' ইত্যাদি। জীবনের কঠিন বাস্তব সত্যকে তিনি উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। জটিল মানব জীবনের রহস্যময় জীবন, তার ব্যর্থতা, হতাশা, বেদনা, বিষণ্ণতা এবং আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমে ক্ষোভের অবসান বার বার তাঁর লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর অন্যতম প্রধান উপন্যাস 'পূর্ণ-অপূর্ণ' (১৯৬৭)।

হাজারিবাগের কাছে গারুভিয়াতে মিলিত হয়েছে তিনজন বিপর্যস্ত মানুষ। সুরেশ্বরের পিতার উপপত্নী থাকার কারণে তার মা আত্মহত্যা করেছিল। সুরেশ্বর একদিন হৈমন্তীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। স্বভাবতই সুরেশ্বরের প্রতি হৈমন্তীর মনে একটা দুর্বলতার জায়গা তৈরি হয়। কিন্তু সুরেশ্বর তাকে আর ভালোবাসে না। শুভঙ্করের ভালোবাসার পাত্রী নির্মলা তার চোখের সামনেই হঠাৎ আগুনে পুড়ে মরল। উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্র জীবনে চলার ক্ষেত্রে প্রবল আঘাত পেয়েছে। আবার আঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনকে জানারও চেষ্টা করেছে। ফলে এক অবিরাম চলার মধ্য দিয়ে প্রতিটি চরিত্র যে পূর্ণতার দিকে যাত্রা করতে চাইছে। কিন্তু এই পূর্ণতাও যে আপাত পূর্ণতা। শুধু তাই নয়, উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র নানা ঘটনার আবহে যেভাবে এগিয়েছে তাতে এই এক জীবনে আদৌ পূর্ণতা সম্ভব কী? কেননা আকাঙ্ক্ষাই যখন জীবনের কঠিন সত্য তখন পূর্ণতার আগেই তো আর এক অপূর্ণ ভাবনা এসে বাসা বাঁধতে শুরু করে মনের গভীরে। সময়ের এই নির্মম সত্যের জীবনভাষ্য বিমল করের 'পূর্ণ-অপূর্ণ' উপন্যাস।

সময়ের প্রবহমানতায় বৈচিত্র্যময় জীবনের যে ভাঙাগড়া, ঐতিহ্য, সংস্কার, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ভাষা এসবই স্থান পায় কথাসাহিত্যে। আমাদের আলোচ্য কথাকার রমাপদ চৌধুরীকে আমরা কালের দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন লেখক হিসেবে চিহ্নিত করেছি। কাজেই সময়ের অভিঘাত এদের প্রত্যেকের লেখায় স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। যদিও আমরা আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে এই সময়ের কেবল পাঁচজন ঔপন্যাসিকের কয়েকটি রচনা সংক্ষিপ্ত করে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এই চেষ্টাও আসলে অন্যান্য লেখকের ধারাকে কিংবা বলা যেতে পারে এই সময়ের কথাসাহিত্যের ধারায় চোখ ফেরানো মাত্র। এই অধ্যায়ে সার্বিক আলোচনার অবকাশও

ততটা নেই। কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলা ও বাঙালির যে সার্বিক বিপর্যয় তা এই সময়ের প্রত্যেক লেখকের কলমে উঠে এসেছে বিভিন্ন ভাবে। তাছাড়া বলা যায়, মানুষকে বাঁচতে গেলে, তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে গেলে কালের আবহমানতায় আস্থা রাখতে হবে। এই বিশ্বাস প্রতিটি লেখককে সময়ানুগ করে তুলেছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অসীম রায় — যাঁদের কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা গেল না তাঁরাও এই পথের পথিক।

সূত্রনির্দেশ :

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃ. ৩৪।

২। তদেব, পৃ. ৮৪, ৮৫।

৩। সতীনাথ ভাদুড়ী, 'জাগরী', প্রকাশ ভবন, ষড়বিংশতি মুদ্রণ ১৪১২, পৃ. ৭।

৪। তদেব, পৃ. ১৬৪।

৫। সতীনাথ ভাদুড়ী, 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', বেঙ্গল পাবলিশার্স, নতুন মুদ্রণ মার্চ-২০১১, পৃ. ৬৯-৭০।

৬। সুবোধ ঘোষ, 'সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প', প্রকাশ ভবন, সপ্তম মুদ্রণ ১৪১৫, পৃ. ১৯।

৭। তদেব, পৃ. ২৬।

৮। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জুন, ২০০৪, পৃ.৭৪।

৯। আশা দেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদনা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী-২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, চতুর্দশ মুদ্রণ ১৪১৬, পৃ. ৮২-৮৩।

১০। তদেব, পৃ. ১৩৭।

১১। অমিয়ভূষণ মজুমদার, 'নিজের কথা', অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র-প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল-২০০৩, পৃ. ১৬।

১২। অমিয়ভূষণ মজুমদার, 'মাকচক হরিণ', অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র-অষ্টম খণ্ড, তদেব, পৃ. ২৫৩-২৫৪।